পুবের কলম পাতাবাহার

ছোট গল্প

শেষ প্রশ্ন

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

কিছুই ভালো লাগছে না। বিগড়ানো মেজাজটা চলে গেছে একেবারে আয়ত্তের বাইরে। সমগ্র মনটাকে কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা গ্রাস করে আছে। কুরে কুরে খাচ্ছে সেটা আমাকে। বিবৃতির ফোনটা আসার পর থেকেই মনের এমন বেহাল দশা। অগোছালো মনের নিয়ন্ত্রণ এখন আর সম্ভবপর নয়। ফোনটা বোধহয় না রিসিভ করাই শ্রেয় হ'ত। তাহলে অন্তত এই ধরনের কথাগুলো শুনতে হ'ত না। অবশ্য সত্য কথা থেকে আর কতক্ষণই বা রেহাই পাওয়া যায়। সত্য যতই রূঢ় হোক না কেন, তার সম্মুখীন হওয়াটা আবশ্যক। আশ্চর্য লাগছে এটা ভেবেই, যে বিবৃতি কেমন করে এমন একটা কথা বলতে পারল! কীভাবে মুখের উপর বলতে পারল, যে এই সম্পর্কটাকে আর না এগোতে দেওয়াই যথোপযুক্ত। এখানেই দাঁড়ি টেনে দেওয়া উচিত— এ সম্পর্কের। কথাটা শোনার পরমুহূর্তেই আকাশ ভেঙে পড়েছে আমার মাথায়। এখন মনে হচ্ছে, কথাটা শোনার পূর্বেই আমার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে গেল না কেন? নাকি বাস্তবেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে আমার শ্রবণ ক্ষমতা? তাই কথাটা শোনার ক্ষেত্রে হয়তো বিভ্রম হয়েছে। এর কারণ সম্বন্ধেও কোনও স্পষ্ট আলোকপাত করছে না সে। আমি জিজ্ঞাসা করতে এড়িয়ে যেতে চাইছে বারবার।

হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ করতেই, সেকেন্ড কয়েকের ভিতরে রিপ্লাই এলো 'কী হল ডিস্টার্ব করছিস কেন? তোকে যা বলার আমি তো বলেই দিলাম।'

লিখলাম, 'বাট টেল মি দ্য রিসন?' কোনও রিপ্লাই এলো না অপর প্রান্ত থেকে। একরাশ চিন্তা চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে আমাকে। ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় অনর্গল ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে সেগুলো মনের মধ্যে। কী কারণ হতে পারে— যার জন্য এমন সরাসরি নাকচ? অন্য কারোর প্রতি প্রেমে-টেমে পড়ল না তো? অবশ্য বিবৃতি যা রূপবতী তাতে ওর তুলনায়, অন্য পুরুষেরই ওর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার নিদারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা যদি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। এমনটা তো হতেও পারে যে, আমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি, সে অন্য কারোর সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করেছে। আড়ালে-আবডালে উভয়ের সঙ্গেই সমতাল বজায় রেখে গেছে। হয়তো সেই লোকটাই ওকে বিয়ে করার জন্য প্রেসারাইজ করছে। বিবৃতি এবং আমার সম্পর্কের যাবতীয় খুঁটিনাটি কোনও প্রকারে জেনে গিয়ে, ওকে ব্ল্যাকমেলের ভীতি-প্রদর্শনটাও অস্বাভাবিক নয়। আবার একত্রে দু'জন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার কথা, সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেওয়ার সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না একেবারে। সেটা না হলে আমাদের দু'জনের এতদিনকার সম্পর্ক, তাসের ঘরের মতো এভাবে ভেঙে খানখান হত না নিশ্চয়ই? এমনটা হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। হাজার হোক মেয়ে মানুষের মন বলে কথা। জানি না কেন আমার মন এই শেষোক্ত কারণটাকেই আঁকড়ে ধরছে বারবার।

উফ! আর এই নিয়ে ভাবতে পারছি না। বাথরুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম। ঠান্ডা জলের ঝাপটা চোখে মুখে দিতেই অসস্তির মেঘ খানিকটা হলেও সরে গেল। স্মৃতিপট হাতড়ে হারিয়ে যাওয়া পুরনো খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগুলিকে আবার জোড়া লাগাতে শুরু করলাম।

বিবৃতির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেবলমাত্র এই কয়েকদিনের গড়ে ওঠা নয়। আমার শৈশব থেকে শুরু করে কৈশোর এবং যৌবনে পদার্পণ করার সমস্ত মুহূর্তগুলো, অতিক্রান্ত হয়েছে তারই সান্নিধ্যে। ছেলেবেলা থেকে দু'জনেরই দু'জনের বাড়িতে যাতায়াত ছিল অহোরাত্র। সত্যি বলতে বিবৃতির মতো প্রিটি গার্ল আমাদের স্কুলে আর একটাও ছিল না বললেই চলে। অনেকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত ওর দিকে। একবার স্কুল আয়োজিত, জেন অস্টিন রচিত 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস' নাটকে, ওর অনবদ্য অভিনয় রীতিমতো ফেলে দিয়েছিল হাততালির ছড়াছড়ি। জীবনের প্রতিটি মোড়ে বিবৃতিকে পাশে পেয়েছি। সেই থেকেই পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছি, যে দু'জনার বাইরে অন্য কাউকে চিনে উঠতে পারিনি। বলাই বাহুল্য, চেনার সুযোগই দিইনি কখনও। সুতরাং ভালোবাসাবোধটাও যে কবেই জন্মে গেছে— তা খেয়াল হয়নি কারোর। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এই ভালোবাসার মধ্যে সম্ভবত কোনও ফাঁক রয়ে গিয়েছিল। নয়তো আজকের এই দিনটার আগমন কখনওই হ'ত না।

মনের ধোঁয়াশা কাটিয়ে উঠতে পারছি না কিছুতেই। শুধু মনে হল, আমার সন্দেহই কি ঠিক— নাকি এ কেবলই আমার বিভ্রম মাত্র? একবার বিবৃতির বাড়িতে গেলে কেমন হয়? মন বলছে, ওর বাড়িতে গেলেই— বোধহয় এই বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। তাছাড়া ওর এমন অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্তের নেপথ্যের কারণটাও তো জানা প্রয়োজন। আমার অনুমানই যদি সঠিক হয়, তবে এর জবাবদিহি করতে ও বাধ্য।

বিবৃতিদের বাড়িটা যেন একটা থমথমে ভাব বিস্তারিত চাদর দ্বারা আবৃত। চতুর্দিকে বিরাজমান চরম শূন্যতা। ওদের বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্রই সেটা পরতে পরতে উপলব্ধি করলাম। একটা ঘরে বিবৃতির ঠাকুমা চুপ করে টিভি দেখছে। কিচেনের মার্বেলের সিংকটার সামনে দাঁড়িয়ে একমনে রান্না করে চলেছে ওর মা। করিডোরের একপাশে রাখা ইজি চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে, দু'চোখ বন্ধ করে রয়েছে ওর বাবা। পাশে রাখা ফোনটায় বেজে চলেছে একটা রবীন্দ্রসংগীতের সেতারের সুর। শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে। আমাকে দেখে কেউই কোনও বাক্যব্যয় করল না। তাদের হাবভাবে কেমন যেন একটা বিমর্ষতা লেগে রয়েছে। হয়তো বিবৃতির এহেন সিদ্ধান্ত তাদেরকেও হতবাক করেছে।

বিবৃতির ঘরে ঢুকে দেখলাম বিছানায় একপাশে প্রস্তর মূর্তির মতো বসে আছে সে। তার শারীরিক নির্বিকারতা আগের আমার দেখা সেই চেনা পরিচিত মেয়েটার উপর ফেলেছে এক অচেনা ব্যক্তিত্বের আস্তরন। হাতে ওটা কী? একটা ছবি নয়? সঙ্গে একটা সাদা রঙের খামও রয়েছে দেখছি। আমাকে দেখ মাত্রই তৎক্ষণাৎ ছবিসমেত সে খামটি বালিশের পাশে রাখা একটা বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

কী গোপন করতে চাইছে? ওর উদ্‌ভ্রান্তের মত হাবভাব এতটাই অপ্রকৃতিস্থ, যেন অন্যের সম্মতি ছাড়াই সে কোনও দ্রব্য নিয়ে নিয়েছে এবং কেউ দেখে ফেলার আগেই সেটাকে চটজলদি লুকিয়ে ফেলল। 'কী ব্যাপার? এখানে কেন এসেছিস?' শিথিল কণ্ঠে বলে উঠল বিবৃতি।

'কী ব্যাপার মানে? কীলুকোচ্ছিস আমার থেকে? ওটা কার ছবি? নতুন বয়ফ্রেন্ড জুটিয়েছিস নাকি?' আমার পাল্টা প্রশ্নে ও উত্তেজিত হয়ে পড়লো, 'দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস। হ্যাঁ, ওটাই আমার নিউ বয়ফ্রেন্ডের ছবি। আর ওকেই আমি বিয়ে করব বুঝলি। নাউ ইউ আর হ্যাপি? এখন যা এখান থেকে।' কথাগুলো শানিত ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার আকারে সমূলে বিঁধে যাচ্ছে আমার বুকে। কথা শেষ করেই বইটা হাতে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিছানায় খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলাম আমি। শেষমেষ তবে আমার সন্দেহটাই বাস্তবায়িত হল। ভাবতে ভাবতে আমার দৃষ্টি ঘুরে গেল বাইরের চৌকাঠের দিকে। সাদা খাম এবং ছবিখানা পড়ে রয়েছে সেখানে। বোধহয় বইটা থেকে পড়ে গেছে। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিলাম সেগুলো। দেখলাম ছবিটা আর কারোর নয়, স্বয়ং আমার। যতদূর মনে পড়ে সম্ভবত গত বছর সেটা একটা পিকনিকে তোলা। বিবৃতিই তুলেছিল ছবিটা। সাদা খামটা থেকে বেরিয়ে এলো একটা রিপোর্ট কার্ড, মেডিকেল রিপোর্ট কার্ড। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে বিবৃতির নাম। এক অজানা আশঙ্কা ইতিমধ্যেই মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে আমার মধ্যে। রিপোর্ট কার্ডের সমস্তটা পড়ে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক ধাপ দীর্ঘায়িত হয়ে উঠল আশঙ্কাটা। নিজের চোখ কি বিশ্বাসঘাতকতা করছে? কারণ রিপোর্ট কার্ডে স্পষ্ট উল্লেখিত আছে যে রোগ, যে মারণব্যাধি বাসা বেঁধেছে বিবৃতির শরীরে। এতদিন মরণসঙ্গী করে সে বয়ে বেড়াচ্ছে যাকে। স্লো পয়েসনিংয়ের মতো তিলে তিলে, যেটা করে চলেছে দেহের ধ্বংস সাধন সেটা ব্লাড ক্যানসার অর্থাৎ রক্তের কর্কট রোগ।

আমার চিন্তাশক্তি, বিচার ক্ষমতা সব কিছু যেন এক লহমায় উঠে গেছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে। চারপাশের পৃথিবীটা যেন ঘুরতে শুরু করেছে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। মন তার সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। মনের কেন্দ্রস্থল একেবারে শূন্য। কিচ্ছু নেই সেখানে, এই ঘর, বারান্দা, আমার বাড়ি, রাস্তা, আকাশ কিচ্ছু নেই। কেবলই অন্ধকার। নিকষ, কালো অন্ধকার। দু'চোখ বেয়ে নেমে এসেছে জলের ধারা। রিপোর্ট কার্ডের ওপর পড়ল দু'ফোঁটা। বারান্দা থেকে তখনও ভেসে আসা সেতারের সুর আছড়ে পড়ছে কানের পাশে।

অচকিতেই কখন যে বিবৃতি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি। ওর একটা হাত স্পর্শ করেছে আমার কাঁধ। আমার হাতে ধরা রিপোর্ট কার্ডের দিকে চেয়ে আছে সজল নয়নে।

দু'হাতে আলতো করে চেপে ধরলাম ওর বিবর্ণ মুখটা। ডাগর হরিণীর মতো তাঁর কাজলকালো চোখ দুটো ঢুকে গেছে গর্তের ভেতরে। মায়াবিভোরতা সৃষ্টিতে নিপুণা, নিষ্পাপ চোখের মণি দুটো এখন সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। একসময় ওই মণি দুটো সর্বক্ষণ খুঁজে বেড়াত আমাকে। ঠোঁটের কোণায় লেগে থাকা যে শান্ত, স্নিগ্ধ হাসিটা আমাকে ব্যস্ত জীবনের ইঁদুর দৌড় থেকে উপড়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিত স্বর্গের নন্দনকাননে, যে হাসি ছিল ভোরের উদীয়মান সূর্যের কোমল আলোর মতো উজ্জ্বল, সেটা আজ সম্পূর্ণ উধাও হয়েছে। আমার বুকে মাথা রেখে অঝোরে কেঁদে ফেলল বিবৃতি। আঁখিজলে কি ধুয়ে যায় চিরন্তন বেদনা? জানা নেই। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হয়তো অপেক্ষায় থাকতে হবে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।

শূন্যতাতেই খুঁজেছি আত্মবিনির্মাণের পথ

তৈমুর খান

পার্থিব জীবন শেষ হতে চলল। অপমানে, গঞ্জনায়, অবহেলায় নিন্দা শুনতে-শুনতেই কেটে গেল জীবন। কাউকে বোঝাতে পারলাম না, আমি কী ও কেমন। কাউকে বোঝাতে পারলাম না আমি, আমার কোনও দোষ ছিল না।

কত রাত আমার ঘুম হয়নি। কত রাত আমি গোপনে গোপনে কেঁদেছিলাম। কত কত রাত খিদের কারণে আমি ওঠবোস করেছিলাম। কাউকে বলতে পারিনি।

রাষ্ট্রও বারবার আতঙ্কিত করেছে। আজও করছে। বাঁচার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। জেনোসাইডের আয়োজন করছে হয়তো তলে তলে। নিজের কাছেই বারবার একটি প্রশ্নের উত্তর পেতে চাই তা হলে কি আর মানবিক দেশ দেখতে পাব না?

পৃথিবীতে যে ক'দিন থাকলাম, নিজের মধ্যে এক ছেলেমানুষি— যাকে সাধুভাষায় 'বালখিল্য' বলে তা-ই করে গেলাম। কিন্তু কেউ কি দেখতে পেলে না আমার ভেতরের বালকটিকে? কী নির্মমভাবে তাকাল আমার দিকে। কী রূঢ় কথা বলল আমাকে। জাতপাত তুলল। ধর্ম তুলল। বংশপরিচয় তুলল। আমি যত ভালোই হই না কেন— কোনওদিনই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারব না। আমার চলার কৌশল, আমার কথা বলার ধরন, আমার পোশাক-আশাক খাদ্যাভাস সবকিছুতেই সাম্প্রদায়িকতা অথবা মৌলবাদের বৈশিষ্ট্য দেখতে পেল অনেকেই। তাই আমার প্রাপ্য ঘৃণা। আমার প্রাপ্য অবহেলা। আমার প্রাপ্য বিতাড়ন।

বহু রাস্তা চলতে চলতে মেপে মেপে পা ফেলতে হয়। কথা বলতে হয় অনেক ভেবে-চিন্তে। পোশাক পরতে হয় নিজের মতো নয়, অন্যরা যেমনটি বলে। কার কাছে সাহায্য চাইব? রাজনৈতিক মানুষেরা তারা দল বদল করে, কিন্তু মন বদল করে না। তাদের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা খুন করার প্রবণতা চিরদিন একই থাকে। শুধুমাত্র অভিনয় ক্ষমতার দক্ষতা বাড়ে। মানবিক হৃদয়ের প্রসারতা কখনোই বৃদ্ধি পায় না।

বাইরের জগতের সঙ্গে যখন সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তখন একান্তে নিজেরই মুখোমুখি বসি। নিজেরই অসহায় মুখ মুছিয়ে দিই। কী বলে সান্ত্বনা দেবো ভাবতে থাকি। ভাবতে ভাবতেই ঐশ্বরিক আমন্ত্রণ পেয়ে যাই। পার্থিব আসক্তির লেনদেন চুকিয়ে যেতে থাকে। নিজেকে সমর্পণ করি অসীম এক শূন্যতার কাছে। তখন নিজেকে শূন্যের মতো মনে হয়। মিলিয়ে যেতে থাকি অদৃশ্য কোনও শক্তির কাছে। পার্থিব ইন্দ্রিয়গুলি কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। চৈতন্য বৃহৎ আকাশের মতো ভাসতে থাকে। কী আমার পরিচয়! নির্দিষ্ট কোনও উত্তর খুঁজে পাই না। দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যায়। তখন কী কবিতা আসে, কী কবিতা লিখতে পারি আমি!

'আমি আজ অনন্তের পথে' এই শিরোনামেই কবিতাটি লেখা হতে থাকে...

'আজ রোদ ওঠেনি/ একাকী হেঁটে যাচ্ছি অনন্তের পথে/ গতকাল যারা বলেছিল দেখা হবে, রাস্তায় দেখা হবে!/ তারা কেউ রাস্তায় আসেনি আমি শুধু নিজেকেই ভালোবাসতে বাসতে/ নিজের সঙ্গেই কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছি।'

আসলে আমার সব কবিতাই অনন্তের পথের ঠিকানা খুঁজেছে। ভাতের গন্ধ থেকে এক ঝলক জৈবিক চেতনা তার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে। তখনও কবিতা এসেছে। কিন্তু সব কবিতাই আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। আধ্যাত্মিক এক প্রশ্রয়ে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে চেয়েছে। পার্থিব সফলতাকে খুব বেশি কাম্য মনে করেনি। জীবনের পূর্ণতা পার্থিব সাফল্যে নির্ভর করে এরকম ধারণা আমার একেবারেই ছিল না। তাই কবিতাতেও খুব বেশি রমণীর ঘ্রাণ যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি পার্থিব বিষয় না পাওয়ার হাহাকারও শোনা যায় না। যে হাহাকার আমার কবিতার মর্মমূলে বিরাজ করে তা আত্মদৈন্যের, তা সেল্ফ-আইডেনটিটির, তা অস্তিত্ব সংকটের এবং অবশ্যই মানবিক সংকটের। ক্ষুধার কাতরতা, যৌবনের অবদমন, প্রেমের ব্যর্থতা, পীড়িত হওয়া, শোষিত হওয়া, অত্যাচারিত হওয়া এসবকিছুরও ছায়া পড়েছে; কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে আধ্যাত্মিক শূন্যতার এক প্রান্তর। যেখানে আমি একান্তে হাসতে চেয়েছি, কাঁদতে চেয়েছি, রাস্তা হাঁটতে চেয়েছি, নিজেকে ভাঙতে চেয়েছি এবং ভেঙে আবার গড়তে চেয়েছি। আত্মবিনির্মাণের নানান কৌশলে শব্দায়িত হয়েছে অনুভূতির তরঙ্গগুলি। পাঠক কি তা জানতে পেরেছেন?

'সর্বনাশের দিকে যেতে যেতে' কবিতায় তাই লিখেছি—

'সর্বনাশের দিকে চলে যেতে যেতে/ আর কিছু দিন থাকতে চেয়েছি/ আর কিছু দিন শুনতে চেয়েছি বাঁশি/ আর কিছু দিন বলতে চেয়েছি / তোমাকেই ভালোবাসি!
সবাই জানে সব মিথ্যে কথা/ এখন সত্যের মতো ব্যবহার হয়/ এখন সবাই জানে আলোতেও লুকিয়ে থাকে অন্ধকার/ বৃষ্টি হয় তো হবে, ছাতাহীন নেমেছি রাস্তায়
বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে, আরও উজ্জ্বল হচ্ছে শেয়ালের চোখ/ পূর্ণিমা আসবে যদিও, ওর জ্যোৎস্নায় মিশে যাবে শোক।'

অন্ধকারও আলোর, আলোরও অন্ধকার থাকে। তাই একটার সঙ্গে আরেকটার বিপরীতগামী সামঞ্জস্য এসেছে। সত্যের পাশে মিথ্যা যেমন। কিন্তু শিয়ালের চোখ যখন উজ্জ্বল হচ্ছে, তখন তো আদিম প্রবৃত্তির জাগরণও ঘটছে। পূর্ণিমা এলেও শোকের বিহ্বলতা কখনো কেটে যাবে না। একাকিত্ব, শূন্যতা আর শূন্যতার সংকেতে জীবন গড়াতে থাকে। তাই কবিতাতেও বলতে হয় 'হাতের মুঠো খুলে খুলে দেখি'। পুরো কবিতাটি এরকম—

'কয়েক দিনের জন্য এখানে এসেছি/ তারপর হারিয়ে যাব/ তারপর অনিবার্য শূন্যতা
মাটি দিয়ে এ দেহ বানিয়েছ/ হৃদয় বানিয়েছ কী দিয়ে?/ হাসি-কান্নার স্রোত নিঃশব্দে বয়ে যায়
রোজ নীরব বাঁশির সুর শুনি/ কে বাজায় বাঁশি? চিনি না তাকেও/ আলো-অন্ধকারে ছায়া নাচে
চলে যাব, অদ্ভুত এই যাওয়া/ হাতের মুঠো খুলে খুলে দেখি/ ধরে আছি আদিম এক প্রত্ন শূন্যতা।'

শূন্যতার সাগরে টিকে থাকতে হলে নিজেকেও শূন্য হতে হয়। এই শূন্যতাই পরম আশ্চর্যের। যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনি জাগ্রতও হয়। যেমন অস্তিত্ববিহীন হয়, তেমনি অস্তিত্বের পুনর্জন্মও দেয়। আমরা যে কিছুই জানি না, অথবা যা জানি তা কিছুই নয়, অথবা সবই শূন্য তা বলাই বাহুল্য। লিও টলস্টয় 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' গ্রন্থে এই কারণেই বলেছেন

'আমরা শুধু জানতে পারি যে আমরা কিছুই জানি না। আর এটাই মানুষের প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ মাত্রা।' এই প্রজ্ঞা সক্রেটিসেরও ছিল। প্লেটো 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থে বলেছিলেন আমি জীবিত সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ, কারণ আমি একটি জিনিস জানি, আর তা হল— আমি কিছুই জানি না। এই 'জানি' এবং 'না-জানা' ক্রিয়া দুটি নাথিংনেসকেই অনুধাবন করে চলেছে। কবিতা তারই ভাষা, তারই প্রকাশ। প্রত্নশূন্যতায় মিলিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই সেই প্রত্নআবেগের যাত্রা।

সাহিত্য-সংস্কৃতির খবর

সৃষ্টির একুশ শতক, উৎসব সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

সাড়ম্বরে প্রকাশিত হল 'সৃষ্টির একুশ শতক' পত্রিকার উৎসব সংখ্যা। কলকাতার রামমোহন হলে কয়েকশো কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত গুণী ব্যক্তির সমাবেশে বিশাল কলেবর পত্রিকাটির মোড়ক খুললেন অধ্যাপক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে যে সারস্বত বৈঠক বসেছিল সেখানে সম্মাননা প্রদান করা হল কবি উদয়ন ভট্টাচার্য ও 'কোরক' সাহিত্য পত্রের সম্পাদক তাপস ভৌমিককে।

এই দিনের অনুষ্ঠানে আরও দু'টি নতুন বইয়ের মোড়ক খোলা হল। একটি বইয়ের লেখিকা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের কন্যার। অন্যটি

রক্তিম ইসলামের নতুন উপন্যাস 'অস্তাচলের আগে'। সমগ্র অনুষ্ঠানে সংগীতের আমেজ এনে দিলেন ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য ও অলক রায়চৌধুরী। কাজী কামাল নাসের শোনালেন নিজের লেখা ও সুরারোপিত কয়েকটি গান। গানগুলির মধ্যে ছিল মেধা ও স্বকীয়তার ছাপ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নাট্যকার চন্দন সেন। 'সৃষ্টির একুশ শতক' পত্রিকার সম্পাদক অরুণ কুণ্ডু জানালেন মানুষের শুভেচ্ছায় আগামী বছর তাদের পত্রিকা কুড়ি বছরে পা দেবে। সমগ্র অনুষ্ঠান কথার মোড়কে সাজিয়ে তুললেন পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা সৌমিত্র লাহিড়ী। —**জি এম আবুবকর**

প্রকাশিত হল মুহাম্মাদ আবদুল আলিমের কাব্যগ্রন্থ

প্রকাশিত হল বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কবি ও ঔপন্যাসিক মুহাম্মাদ আবদুল আলিমের কাব্যগ্রন্থ 'নগ্নকাল'। ৪৮ পাতার গ্রন্থটিতে মোট ৪০টি কবিতা রয়েছে। লেখকের এর আগেও একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকমহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। তবে এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার দেশ প্রকাশন থেকে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কুতুব আহমেদ।

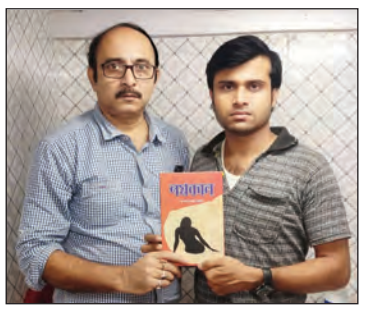

আইনজীবী সরদার আমজাদ আলীর গ্রন্থ প্রকাশ

গত ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেসক্লাবে প্রকাশিত হল আইনজীবী সরদার আমজাদ আলীর দুইখানি গ্রন্থ। 'আহির ভৈরবী' আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন ভাষাবিদ অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার। 'Peeping through the glazed window' বইটি প্রকাশ করেন অধ্যাপক ড. চিন্ময় গুহ। অনুষ্ঠানের সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি তাঁর ভাষণে সরদার আমজাদ আলীর সঙ্গে ওকালতি জীবনের সোনালি স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন— আমজাদ সাহেব দেশ-কাল, রাজনীতি, সমাজ সচেতন মানুষ। তাই তাঁর যে দু'খানি গ্রন্থ আজ প্রকাশ পেল— তা পাঠকদের শুভ-চেতনার উন্মেষ ঘটাবে। অনুষ্ঠানে 'আহির ভৈরবী' গ্রন্থ থেকে একটি অংশ পাঠ করে শোনান আইনজীবী অমল মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন আমজাদ পুত্র শাহিন ইমাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইনজীবী সুচরিতা রায়।

আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব

মুক্তার আলম: চারিদিকে যখন সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক্রমশ কমে আসছে তখন দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর 'সহচলি নাট্য অ্যাকাডেমি' জেলায় নাট্যপ্রেমী ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের মনে নিয়ে এল একগুচ্ছ আন্তর্জাতিক নাটকের পরিবেশন। এদিন বিশিষ্ট নাট্যকার প্রদীপ ভট্টাচার্য ও শেখর সমাদ্দার এই আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবের সূচনা করলেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুকান্ত ভবনে। এদিনের স্বাগত ভাষণে মহকুমা শাসক প্রমোদ পি বলেন, এই ধরনের আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব যত বেশি বেশি হবে সমাজ ততই সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বলিষ্ঠ হবে। এই উৎসবের অন্যতম কর্মকর্তা ব্রতশীষ সাহা ও সুভাষ দাস বলেন, আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্যান্য রাজ্যের মধ্যেও সংস্কৃতি-সাহিত্যের আদান-প্রদান ঘটানোর চেষ্টা আগামীতে আরও করব।

'অনিলা দেব্যা স্মৃতি পুরস্কার' পেলেন বাচিকশিল্পী সাদেকুল করিম

মালদা শহরের চিন্তামণি চমৎকার বালিকা বিদ্যালয়ে গত ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব। এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল, অসম, বিহার ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কবি, সাহিত্যিক, প্রকাশক ও বাচিকশিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে মোট ৬টি স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মধ্যে 'অনিলা দেব্যা স্মৃতি পুরস্কার' পান বারাসতের বিশিষ্ট কবি, শিক্ষক ও বাচিকশিল্পী সাদেকুল করিম। শতাধিক কবি-সাহিত্যিক, প্রকাশক ও বাচিকশিল্পী উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকা ও কয়েকটি গ্রন্থও। *—ইনামুল হক*

'কামদুঘা' পত্রিকার ৩৫ বর্ষপূর্তি

পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিত 'কামদুঘা' পত্রিকা ৩৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারাদিন সাহিত্যিক সভায় চাঁদের হাট বসলো গুসকারায়। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাহিত্য সভা ও গুণীজন সম্মাননা প্রদান হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন জেলা থেকে কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন ছিলেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন 'পদ্মশ্রী' প্রাপ্ত শিক্ষক সুজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়। কামদুঘা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক সুপ্রিয় অধিকারী। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক কুমুদরঞ্জন মণ্ডল।